সংবাদ

তারিখ ... 4 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

ফিচার

আদিবাসীদের শিক্ষাচিত্র

কাঞ্চন দত্ত

বাঙালি ছাড়াও বাংলাদেশে রয়েছে অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও ভাষাভাষীর মানুষ। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থাকলেও নেই যুগোপযোগী শিক্ষা। একই দেশে বসবাস করেও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে আদিবাসীরা। বেসরকারি হিসাবে সারাদেশে ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করছে। এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে নির্ভর করার মতো লিখিত তথ্যেরও অভাব রয়েছে, কারণ আদিবাসীদের শিক্ষার হার উল্লেখ করার মতো নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শেষ বর্ষের ছাত্রী শাপলা চাকমা (২৩) বললেন, আদিবাসীরা বাঙালিদের তুলনায় শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। এর প্রধান কারণ সরকারি সহযোগিতার অভাব। যারা শহরে থাকেন তারা লেখাপড়ার ব্যাপারে সচেতন হলেও দুর্গম পাহাড়ে যারা বাস করে তাদের অনেক সমস্যা পোহাতে হয়। এছাড়া মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকায় অনেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। একটি আদিবাসী বাচ্চা জন্মের পর সে তার মায়ের ভাষায় কথা বলে। হঠাৎ করে যখন বাংলা ভাষায় পড়ালেখা শুরু করতে হয় তখন তারা সমস্যায় পড়ে যায়।

আদিবাসীদের একটি বড় অংশের বসবাস পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। আদিবাসী জনসংহতি সমিতির তথ্যমতে, এ অঞ্চলে রয়েছে এগারোটি জাতিসত্তার বাস। এখানে সরকারি সহযোগিতার অভাবে পর্যাপ্ত স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেগুলো আছে সেগুলোতে সেটেলার বাঙালিদের প্রভাব অনেক বেশি। সিলেটের খাসিয়া ও উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল, রাজবংশী, কোচ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হারও নাজুক। বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান সূত্রে জানা যায়, এসব জেলাগুলোতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায়। শিক্ষকরাও সবাই বাঙালি। এখানে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার শতকরা ৬০ ভাগ যার মধ্যে ৫০ ভাগই হলো আদিবাসী।

আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদিকা রাখী ম্রং বললেন, সমতল ভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের শিক্ষার হার সমান নয়। পাহাড়ে চাকমা মারমা সম্প্রদায় শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে। ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির পর পাহাড়ের স্কুল কলেজগুলোতে আদিবাসীদের ভাষার ওপর একটি বিষয় পড়ানো হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এটি পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু তা আজও পূরণ হয়নি। শান্তিচুক্তির পর পাহাড়ে শিক্ষার হার একটু বাড়লেও তা সব জায়গাতে হয়নি।

সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আদিবাসীদের জন্য নিজস্ব পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগ নিতে পারে। কারণ মাতৃভাষা দিয়ে শিক্ষায় হাতেখড়ি হলে পরবর্তী সময়ে একটি শিশু বহু ভাষায় পারদর্শী হওয়ার জন্য শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারবে। এভাবেই সাংস্কৃতিক বহুত্ব, বৈচিত্র, আর ভিন্নতাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীও উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারবে। সমৃদ্ধ হবে দেশ ও জাতি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইডেন কলেজের এক আদিবাসী ছাত্রী বললেন, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইদানীং বিপুলসংখ্যক মেয়ে পড়ালেখা করে। তারা নানারকম কাজ করতে বাইরে যায়, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের মেয়েরা যখন তখন বাইরে যেতে পারে না। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, স্কুল কলেজ পর্যাপ্ত না থাকায় তারা দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। মেয়েদের এক্ষেত্রে অবহেলা করে কোন সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি এনফোর্সমেন্ট অব হিউম্যান রাইটস (বিএসইএইচআর) এপ্রিল, ২০০৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ ইন্ডিজেনাস পিপলস স্টিল ফেস ডিসক্রিমিনেশন শীর্ষক এক গবেষণায় দেখিয়েছেন শতকরা ৩০ দশমিক ১২ ভাগ আদিবাসী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না, যাদের মধ্যে শতকরা ২২ দশমিক ৮৯ ভাগ ভয় ভীতি ও নির্যাতনের শিকার হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের আদিবাসী ছাত্র প্রশান্ত বর্মণ বললেন, আদিবাসীদের শিক্ষা পরিস্থিতি এলাকা ভেদে বৈষম্যমূলক। তার মধ্যে পাহাড়ের স্কুল কলেজের গড় দূরত্ব দুই তিন কিলোমিটার। এছাড়া অধিকাংশ আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় তারা লেখাপড়ার খরচ বহন করতে পারে না। মা বাবা শিক্ষিত না হওয়ায় তারা লেখাপড়ার মূল্য বুঝতে পারে না। আদিবাসীদের শিক্ষার হার বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যেটুকু উদ্যোগ নেয়া হয় তা শুধু পাহাড়েই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ আদিবাসী বলতে এখনও সাধারণত পাহাড়িদেরকেই বোঝানো হয়। সমতল ভূমির আদিবাসীদের নিয়ে চিন্তা করা হয় কম।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে এবং দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী নাগরিক বাঙালি বলে পরিচিত হবে। দেশের সংবিধানে তাদের কোন স্বীকৃতি নেই। কারণ আদিবাসীরা বাঙালি নয়। আদিবাসী গবেষকদের মতে, তাদের যে কোন অধিকারের স্বীকৃতির আগে সাংবিধানিক স্বীকৃতি জরুরি। এটির অভাবে তারা নিজভূমে পরবাসী হয়ে বাস করছে।

২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে বেসরকারি সংস্থা গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভকে (আরডিসি) দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেছেন, উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ শিক্ষা। যদি আমরা শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে পারি তাহলে উন্নয়নের প্রথম ধাপও অতিক্রম করতে পারব। কিন্তু অধিকাংশ আদিবাসী স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঝরে পড়ার সংখ্যা খুব বেশি। এর প্রধান কারণ হিসেবে তারা বলছে যে, তারা যখন স্কুলে যাচ্ছে, অন্য ভাষায় পড়তে গিয়ে আনন্দ পাচ্ছে না। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই মাতৃভাষায় করা উচিত।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং বললেন, আদিবাসীদের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার মূল কারণ আদিবাসী সংস্কৃতি ঐতিহ্যের স্বীকৃতির অভাব। তাদের নিজস্ব অধিকার, ইস্যু মূলধারায় একেবারেই উপেক্ষিত। নিজস্ব ভূমি ও বনাঞ্চলের ওপর অধিকার তারা হারিয়ে ফেলছে। এক কথায় বলা যায়, তারা প্রান্তিক অবস্থানে পৌঁছেছে। চরম দারিদ্র্যের কারণে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে না। তাছাড়া, শিক্ষার কারিকুলাম তাদের আকর্ষণ করে না। বাংলা আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা নয়। এটি তাদের দ্বিতীয় ভাষা। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা তাদের অনুকূলে নেই।

সঞ্জীব দ্রংয়ের মতে, আদিবাসীদের শিক্ষাচিত্র বদলে দেয়ার জন্য আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, বৃত্তির ব্যবস্থা করা ও আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া জরুরি। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে এজন্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উচিত হবে আদিবাসী সংগঠন ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা।

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার্থে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বলা হয়েছিল, চাকরি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীরা যতদিন দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে না পারবে ততদিন সরকার তাদের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা রাখবেন। এজন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবেন। প্রয়োজনে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্যও সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আদিবাসীদের মতে, চুক্তিতে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধার খুব কমই তারা ভোগ করছেন।

আদিবাসীদের শিক্ষিত হওয়ার জন্য বা শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য সরকার, সুশীল সমাজ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ সমাজের সর্বস্তর থেকে জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে বিপন্নপ্রায় এসব নৃগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্যও।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন শীর্ষক এক সম্মেলনে বিভিন্ন জাতিসত্তা, সম্প্রদায় ও সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ রাঙ্গামাটি ঘোষণাপত্র নামে কিছু দাবি তুলে ধরে। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যালয় স্থাপনের জোর দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু দশ বছর পরও তাদের একই দাবিতে কাজ করে যেতে হচ্ছে। বাস্তব অবস্থার উন্নতি একটুও হয়নি। নিউজ নেটওয়ার্ক।